টি২০-এর জন্য চাঁদা ও করপোরেট জগতের সরকার

সাজ্জাদ জহির

আকস্মিকভাবে মাঝরাতের টকশো থেকে যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে তা জানি না, বিরতিকালে উপস্থিত অন্যদের সঙ্গে কথোপকথনে বুঝতে পারি যে কর, চাঁদা ও বৈধতা প্রশ্নে আমার অবস্থান অনেককে বিস্মিত করেছে। টি২০ ক্রিকেট আয়োজনের আংশিক খরচ মেটাতে কথিত 'চাঁদা' সংগ্রহের উদ্যোগের বৈধতা নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (বাংলাদেশ) বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে নানা জনের নানা মত রয়েছে। অনেকে টিআইবির সঙ্গে একমত হয়ে বৈধতাকে প্রাধান্য দেবেন, অনেকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কথা তুলবেন। আমি মনে করি যে, এ দেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বৈধতার আলোচনা অহেতুক কালক্ষেপণ ঘটাবে— বরং মন্ত্রীর উদ্যোগে অর্থ উত্তোলনের তাৎপর্য অনুসন্ধান এবং 'বিশ্বায়নে'র যুগে রাষ্ট্র ও সরকারের পরিবর্তনশীল চরিত্র অনুধাবন করা অধিক জরুরি। কিছুটা একপেশে (দলছুট) হয়ে তাই এ নিবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা উত্থাপনে সচেষ্ট হব।

চাঁদা তোলা কি বৈধ? জনৈক মন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদমাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গত বছর ৬০ কোটি টাকা 'চাঁদা সংগ্রহ' করা হয়েছিল। যদি কাগজে-কলমে তা করা না হয়ে থাকে, ঘটনাটির অস্তিত্ব কেবল একজন ব্যক্তির স্বীকারোক্তিতে! যখন একই ব্যক্তির বক্তব্যের স্থিতি নিয়ে প্রকাশ্যে কটাক্ষ করা হয়, আদালত চত্বরে এই বৈধ অবৈধের বিতর্ক কীভাবে নিহিত হবে, তা বাড়তি কালক্ষেপণের খোরাক জোগাতে পারে! যদি সরকারি কোষাগারে জমা না পড়ে এই অর্থ সংগৃহীত ও ব্যয় করা হয় এবং একই ব্যক্তির বক্তব্য নতুন মোড়কে উপস্থাপিত হয়, তাহলে বৈধতার আলোচনাটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। কারণ এ বিতর্ক থেকে নতুন জ্ঞানপ্রাপ্তির যেমন সম্ভাবনা নেই, তেমনি পুরো ঘটনার অনাকাঙ্ক্ষিত দিকগুলো আগামীতে বর্জন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

যেকোনো আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা থাকা আবশ্যক এবং তা যদি জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট হয়, তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অধিকতর জরুরি। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে, গত বছরে এ-জাতীয় 'চাঁদা' সংগ্রহ কার মাধ্যমে করা হয়েছিল? এবং তা কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল? যারা চাঁদা দিয়েছিলেন, তাদের হিসাবের খাতায় (যা বার্ষিক অডিটের আওতায় থাকার কথা) এই দানকে কীভাবে দেখানো হয়েছিল? এবং যিনি বা যেসব প্রতিষ্ঠান সমুদয় অর্থ পেয়ে নির্দিষ্ট খাতে (বা অন্য কোনো কাজে) ব্যয় করেছেন, তার হিসাব কোথায়? বৈধতার চেয়েও স্বচ্ছতার দাবিটা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অধিকতর জরুরি, অন্যথায় বৈধতার আইনি মারপ্যাঁচে হাজারো বুদ্ধুদের মতো এ বিষয়ও তলিয়ে যাবে। নিবন্ধটি লেখার সময় টিভি পর্দায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে চেক প্রদান পর্বটি দেখেছি। যত দূর জেনেছি, যেটাকে অনুদান মনে করা হচ্ছে, তা কার্যত আগাম কর। অর্থাৎ আগামীতে প্রদেয় আয় বা মুনাফা করের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।

যারা মন্ত্রী মহোদয়ের চাঁদা সংগ্রহের উদ্যোগের বৈধতা নিয়ে সোচ্চার, তারা সবাই কমবেশি স্বীকার করেন যে, স্বচ্ছতাই মুখ্য বিষয়। তবে তাদের বিশ্বাস যে বৈধ কাঠামোর ভেতর থাকলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব। যুক্তি পরম্পরায় এ পর্যায়ে এসে আমি থমকে যাই— আসলেই কি বৈধতা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে? অর্থাৎ সব বৈধ কর্মকাণ্ডে কি স্বচ্ছতা রয়েছে? আমাদের চারপাশে 'অবৈধ' (এবং অনৈতিক) কাজ করে তাতে বৈধতার লেবাস লাগানোর কাহিনী অনেক। অতীতের প্রসঙ্গ টানলে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইনে যে বিশাল পরিমাণ জমি সরকারের হাতে এসেছিল, তা আজ নানান ব্যক্তি সুচারুভাবে নিজেদের নামে দলিল করিয়ে নিয়েছেন। বর্তমানের দৃষ্টান্ত দেয়া যাক, পূর্বনির্ধারিতভাবে আইনকে একপেশে ও অস্বচ্ছ রাখার ফলে শেয়ারবাজারে তথাকথিত বৈধ লেনদেনের মাধ্যমে অগণিত মানুষের সঞ্চয় গুটিকতক হাতে হস্তান্তর হতে আমরা এ দেশে কমপক্ষে দুবার দেখেছি। অথবা ভাবুন, রাজউক বা প্রধানমন্ত্রী যেসব স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানবিশেষকে স্বল্প মূল্যে বা বিনে পয়সায় বণ্টন বা দান করেন, অথবা এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে ভারতীয় ওএনজিসি ভিদেশ লিমিটেড ও তার সহযোগী অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের এসএস-৪ ও এসএস-৯ ব্লকে গ্যাস অনুসন্ধান-সংক্রান্ত যে চুক্তি বাংলাদেশ সরকার করেছে, তা কি বৈধ নয়? অথচ এসব ক্ষেত্রে 'বৈধতা' কি স্বচ্ছতাকে নিশ্চিত করেছে?

দুটো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব— কোনো কাজ বা আচরণ আইনে অনুল্লিখিত থাকলেই তা অবৈধ গণ্য করা সমীচীন নয় এবং কেবল বৈধতার ঢাকঢোল পিটিয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস, সবাই এটাও স্বীকার করবেন যে, নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক আইনের বাইরে অনেক দরকষাকষি ও বোঝাপড়া হয়, যা পরবর্তী সময়ে কাগজে-কলমে আইনি ছকে ফেলে সিদ্ধ করা হয়। অবাক হলেও সত্য যে, এমনকি কর আদায়ের কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা সে-জাতীয় বোঝাপড়ার বৈধতা দিয়ে থাকি এবং আদায়কারীর জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থাও থাকে! বর্ধিষ্ণু ক্রীড়াবাজারে এ-জাতীয় দরকষাকষিতে সরকারের কোনো অঙ্গসংগঠনকে যদি অংশ নিতে হয়, তাহলে প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে কাজ করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এবং সে কারণেই স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা আরো বেশি জরুরি।

চাঁদা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Contribution বা Subscription. মাঝে-মধ্যে ফি কথাটির সমার্থক হিসেবেও দেখা হয়। আমরা বনভোজনে গেলে চাঁদা দিই, ক্লাবের সদস্যপদ রাখতে চাঁদা দিই, এলাকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য সমিতিকে চাঁদা দিই। এছাড়া রয়েছে মসজিদ বা স্কুল কমিটির চাঁদা। সাধারণত কোনো একটি সেবা পাওয়ার লক্ষ্যে বা প্রাপ্তির বিনিময়ে জীবনের প্রায় প্রতিটি অঙ্গনে আমরা চাঁদা দিয়ে থাকি। উল্লিখিত কোনোটিতেই 'চাঁদাবাজ'দের তিরস্কার বা অস্ত্রের মুখে বাধ্য হয়ে অর্থ বা অন্য সম্পদ হস্তান্তর জড়িত নয়। বরং স্বতঃস্ফূর্ততাবে আমরা কিছু প্রাপ্তির উদ্দেশে এই চাঁদা দিয়ে থাকি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন— সেতু বা হাটবাজারে টোল, গাড়ি পার্কিংয়ে ফি অথবা প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিলে অর্থদান সরকারের কোনো নির্দেশ অনুযায়ী হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক যোগাযোগে প্রদেয় চাঁদা সরকারি আইনের বাইরে। এসব কি তবে অবৈধ? ভিন্নভাবে বললে, এসব সামাজিক ও আর্থিক যোগসূত্রতার উপযোগিতাকে কি আইনের অনুপস্থিতির দোহাই দিয়ে ক্ষুণ্ন করা সম্ভব? বলতে দ্বিধা নেই, বর্তমানের আইন-কাঠামো প্রণয়নের আগে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান বা এনজিও কর্মসূচি সম্পর্কে একই মন্তব্য করা যায়!

আমরা সরকারকে যে কর দিই, তার বিনিময়ে একটি দেশের নাগরিকরা সেবা আশা করে; এবং সে অর্থে এটা চাঁদাতুল্য। দুঃখের বিষয়, আমার সহকর্মীদের অনেকেই এ মন্তব্যে আঁতকে উঠবেন। ব্যক্তির আয়কর, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মুনাফা কর, ব্যাংকে গচ্ছিত আমানতের সুদের ওপর প্রদেয় আগাম আয়কর, একটি এফডিআরের ওপর শুল্ক— এ সবই কোনো সরকারি বিধিমালার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পথে অর্জিত হয়ে সরকারি কোষাগারে জমা পড়ছে। বিধিমালার কারণে বৈধ বলছি এবং সরকারি বলে এসব অর্থ আদায়কে 'রাজস্ব আদায় বা কর' বলে আখ্যায়িত করছি। আইনের ছত্রচ্ছায়ায় আসার ফলে এর যে একটা 'চাঁদাবাজি' রূপ রয়েছে, তা আমরা অনেক সময় ভুলতে বসি। অতীতের তুঘলকের স্বৈরশাসনের গল্প শুনলে সেই রূপটিই ফুটে ওঠে। অথচ আধুনিক রাষ্ট্রে কর দেয়াকে আমরা নাগরিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করি। আমি নিজেও অনেক সময় বলেছি, 'আমি কর দিলেই নাগরিক হিসেবে সরকারকে জবাবদিহি করার নৈতিক অধিকারবোধ জাগতে পারে।' অনেকেই সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সবার ভোটে নির্বাচিত সরকার গঠনের পথকেই উত্তম হিসেবে গণ্য করেন। তবে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেন যে, রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের পিচ্ছিল পথে সে জবাবদিহিতা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে পড়েছে। সরকারি প্রশাসন রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়মিত সেবা প্রদানের জন্য করপ্রাপ্তির মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং এখানেই সেবাকেন্দ্রিক চাঁদার সঙ্গে করের সাদৃশ্য রয়েছে। তবে আমরা চাই বা না চাই এবং গণতন্ত্র নামক রাজনৈতিক লেবাস দিই বা না দিই, সরকার নামক প্রশাসনকে অনেক ক্ষেত্রে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে হয়। মন্তব্যটি কমবেশি অন্যান্য সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বার্ষিক বাজেটের মাধ্যমে আমরা সেসব কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা আশা করি। যদিও প্রাথমিকভাবে সরকারি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে করারোপ করা হয়, বাজারপ্রসূত ত্রুটি দূর করার মাঝেই এর অর্থনীতিক যৌক্তিকতা। আপেক্ষিক কর বা কর-রেয়াতের হার হেরফের করে এবং ভর্তুকি (সাবসিডি) দেয়ার মাধ্যমে কোনো কোনো বাণিজ্যিক খাত বা প্রতিষ্ঠানকে ইতি বা নেতিবাচক প্রণোদনা দেয়া সম্ভব। আরো লক্ষণীয়, রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের মাঝে যোগসূত্র তৈরি করে যেমন সম্পদের পুনর্বণ্টন সম্ভব, তেমনি নির্দিষ্ট বিনিয়োগ অর্থায়নে লাভবানদের আর্থিক অনুদান (বা চাঁদা) সংগ্রহ সম্ভব। অর্থাৎ নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহনের জন্য কিছু টার্গেটেড (পূর্বচিহ্নিত) সুফলভোগীর (বেনিফিশিয়ারি) কাছ থেকে করতুল্য অনুদান আদায় করা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত। যদি টি২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানাধীন বিদ্যুৎ বা ব্যাংকিং খাতে সরাসরি অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনে সহায়ক হয়, সেসব খাত থেকে আগাম অনুদান বা কর নেয়া অযৌক্তিক হবে কি? তবে অর্জিত অর্থের ব্যবহারে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে অর্থ সংগ্রহের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। আলোচনার বাকি অংশে এই উপমহাদেশে ক্রীড়া বাণিজ্যের প্রসার ও সরকারি ব্যবস্থাপনায় তার সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব। সেই বাণিজ্য থেকে লভ্যাংশের অংশীদার হতে গিয়ে দেশজ ক্রীড়া সম্পদ ও সংস্কৃতি বিসর্জনের যে ঘটনা বর্তমানে উন্মোচিত হচ্ছে, সে আলোচনা এখানে টানব না।

কিছুটা দেরিতে হলেও ১৯৯৭ থেকে আমি বাংলাদেশ ক্রিকেটের আশা ও মানসিক বিপর্যয়ের যাত্রাপথে চিরসঙ্গী। গত কয়েক মাসের উপর্যুপরি কয়েকটি ঘটনা বাংলাদেশের ক্রিকেটকেন্দ্রিক আত্মপরিচয়ের স্থায়িত্ব সম্পর্কে আমাকে সন্দিহান করে তুলেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলে ত্রি-দেশীয় কমিটির আধিপত্য, নতুন ফরম্যাট ও অর্থবণ্টনের অনুমোদনে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারপারসনের ভূমিকা, সাকিবকে শাস্তি দেয়ার নামে কার্যত এ দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের শাস্তি দেয়ার অদ্ভুত নজির, আইপিএল-২০১৪'কে স্থান দিতে দক্ষিণ আফ্রিকার অপরাগতা ও বাংলাদেশে তার মধ্যাংশ অনুষ্ঠানের অস্পষ্ট (এবং প্রতিশ্রুতিবিহীন) উল্লেখ, বাংলাদেশ ক্রিকেটের প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের স্পষ্টত অবজ্ঞা, একটি আন্তর্জাতিক ইভেন্টের সূচনা অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র (হোস্ট) বাংলাদেশের উপস্থিতি, যা দেশের বাইরের কোনো টিভি চ্যানেলে দেখানো হয়নি এবং এমনকি espncricinfo.com-এ যার কোনো উল্লেখই নেই। তালিকা আরো লম্বা করা যায় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে স্পষ্টতার নিদারুণ অভাব— একটি প্রশ্ন থেকে হাজারো প্রশ্ন মনে জাগে! কেবল দেশপ্রেম ও ক্রিকেটের প্রতি ভাবাবেগ দিয়ে এর যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া দুষ্কর। তাই এসবের সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য আমি অর্থনীতির অঙ্গনে খুঁজে ফিরেছি। তথ্যের অপর্যাপ্ততার কারণে বিশদ আলোচনায় না গিয়ে নিম্নে কিছু মৌলিক প্রবণতা চিহ্নিত করে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য উল্লেখ করছি।

১৯৭৭ সালে কেরি প্যাকারের উদ্যোগে ক্রিকেট ফরম্যাটে পরিবর্তন এনে টেলিভিশনে সরাসরি খেলা দেখানো শুরু হয়। সেই সঙ্গে শুরু হয় এ খেলার বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া। ২০০৮ সালে শুরু হওয়া আইপিএল সেই বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়াকে একটি নতুন ধাপে উন্নীত করে, যার সঙ্গে বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের এবং তাঁদের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার স্বার্থ জড়িয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, ক্রিকেট থেকে বার্ষিক আয় (যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে টিভি স্বত্ব বিক্রি করে) এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে এবং বর্তমানে আইপিএলের আয় সম্ভবত বাংলাদেশ সরকারের কর ও করবহির্ভূত মোট বার্ষিক আয়ের এক-দশমাংশের অধিক! যদিও জগমোহন ডালমিয়া, যার ঢাকার সঙ্গে নাড়ীর টান রয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে আন্তর্জাতিক ক্ষমতার আসনে উন্নীত করেন, অতিমুনাফার গন্ধে আকৃষ্ট উপমহাদেশের 'বনেদী' (পশ্চিম ভারতীয়) ব্যবসায়ীদের হাতে তার নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। আজ আইপিএলের সম্প্রসারণে উন্নত অনেক দেশের ক্রীড়া ব্যবসায়ীরাও সন্ত্রস্ত এবং তাদের নিজ নিজ দেশভিত্তিক স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত। ক্রীড়ামোদীদের মাঝে একপেশে দেশপ্রেম থাকার কারণে ভারতের বিশাল বাজারকে অগ্রাহ্য করা কঠিন, বিশেষত অন্যরা যদি সেই বাজার থেকে প্রাপ্ত আয়ে ভাগ বসাতে অধিক আগ্রহী হয়! যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান (আইসিসি) একসময় টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো এবং দেশপর্যায়ে যেসব সদস্য-সংগঠন ছিল, সামগ্রিক বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সেসবে পরিবর্তন আসাটাই স্বাভাবিক। আমাদের পূর্বভাবনা না থাকায় চলমান অনেক ঘটনায় আমাদের জাতীয় অহংয়ে আঘাত লেগেছে!

মাত্র দেড় মাস আগে সম্ভিত বালের একটি নিবন্ধ পড়েছিলাম। সেখানে তিনি নির্দ্বিধায় উল্লেখ করেছেন (লেখকের ভাষান্তর)— ভারতীয় দয়া (munificence) ও আইসিসির অর্থের ওপর নির্ভর করে অনেক (দেশের ক্রিকেট) বোর্ড অলস, অদক্ষ ও পরনির্ভর হয়ে পড়েছে। ভিন্নভাবে বললে, অতীতের অর্থবণ্টন নিয়মে আমাদের মতো দেশের ক্রিকেট বোর্ড বিনা পরিশ্রমে অর্থ পাচ্ছিল, যা তাদেরকে পরনির্ভর করে তোলে। পেছনের দিকে তাকিয়ে তাই অবাক হচ্ছি না যে, বিনা পরিশ্রমে অর্থপ্রাপ্তির রীতি চালু থাকার নিশ্চয়তা পেলে যেকোনো খাজনাভোগী শ্রেণীর লোক আত্মসম্মান ভুলে যেকোনো দাসখতে সই করে আসতে পারে। স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে করে, আমাদের ক্রিকেট বোর্ডের আয়ের উৎস কী এবং তা কীভাবে কোন খাতে খরচ হচ্ছে। ইন্টারনেট ঘাঁটতে গিয়ে অবাক হলাম, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড নামক সংগঠনের অডিট প্রতিবেদনের হদিস পেলাম না।

নিবন্ধের শুরুতে আমার ধারণা ছিল যে, বাইরের বাণিজ্য স্বার্থ আগ্রাসী রূপ নিলে তা দেশজ (স্বাধীন) প্রতিষ্ঠানকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেয় এবং তার স্থলে কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত তাঁবেদার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। সে ধরনের পরিস্থিতিতে অনেক সময় জাতীয় সরকার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষার্থে এগিয়ে আসতে পারে। ইন্টারনেট অনুসন্ধানের ফলাফল থেকে মনে হয়, দেশজ প্রতিষ্ঠানটি এতই দুর্বল যে, সম্ভিত বালের উক্তিটিই সম্ভবত সত্যি! সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে, যারা ক্ষমতায় আসীন, তারা কি বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত খাজনা নিজেদের ব্যক্তিগত দখলে রাখতে চান বলেই বিসিবি-জাতীয় দেশজ প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে রাখেন? কাঙ্ক্ষিত অবস্থা হবে, দেশজ প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ও জবাবদিহিতামূলক হিসেবে গড়ে তোলা। এর বিকল্প, যেমনটি এবার অনুদান সংগ্রহ করা হলো— যা পক্ষান্তরে প্রশাসন ব্যবস্থাকেই অধিক দুর্বল করবে। এ-জাতীয় উদ্যোগ কেবল কর প্রশাসনকেই হেয় করে না, ব্যক্তি খাতের জবাবদিহিতাকেও বিপন্ন করে। বিসিবি বা বিপিএলকে নিয়ে আর্থিক অনিয়মের অনেক গল্প শোনা গেছে, সে-জাতীয় অপবাদ রাজনীতির সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে ঘিরে হোক, তা কারোরই কাম্য নয়। সরকারের কর নির্ধারণের জন্য অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ পাচার ও বিরোধী প্রয়াসে বা কোনো 'জঙ্গিবিরোধী' উদ্যোগে সহায়তা করতে অথবা শেয়ারহোল্ডারদের কাছে দায়বদ্ধতার অজুহাতে আমরা প্রতিটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন খুঁটিয়ে দেখতে চাই। অথচ সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় প্রতিটি বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের হিসাব আইনগতভাবে নিশ্চিত করছি না! এ অবস্থায় পরিবর্তন আসা জরুরি।

ক্রিকেট বাণিজ্য ও তার সম্প্রসারণের তাৎপর্য নিয়ে আরো বিশদ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। পরিসরের স্বল্পতার কারণে সম্ভব হলো না। সাধারণত যেসব দেশে অব্যবহৃত বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বেড়েছে, সেখানেই নানা ফাটকাজাতীয় ব্যবসা ভিড় জমিয়েছে। এবং দেশপ্রেমের ভাবাবেগে আবিষ্ট ক্রিকেট দর্শককে প্রলুব্ধ রেখে যেমন সেসব ব্যবসায়ী লাভবান হন, তেমনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে সাধারণ নাগরিকদের তুষ্ট রাখার এমন সুন্দর বিকল্প খুব কমই আছে। এ খেলায় ব্যাংক খাত যেমন লাভবান হয়, তেমনি ডে-নাইট খেলার সুবাদে ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ-ব্যক্তি খাতও মুনাফার সুযোগ পায়। বিশাল অঙ্কের খাজনা ভাগাভাগিতে শ্রম ও পণ্য রফতানি থেকে (এবং সম্ভবত গ্যাস ও তেল বিক্রি থেকে) দেশের আয় শেষাবধি স্থায়ী সম্পদে রূপান্তর হতে ব্যর্থ হতে পারে। শুধু তা-ই নয়, স্টেডিয়াম নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎ ব্যয়ভার ইত্যাদি ক্রিকেট খাতে বিনিয়োগ সর্বোত্তম কিনা এবং তা থেকে দীর্ঘমেয়াদি আয় নিশ্চিত কিনা, ভেবে দেখা প্রয়োজন। পরিশেষে ক্রিকেটপাগল বাংলাদেশীদের জন্য সতর্কবাণী— আমরা হঠাৎ করে প্রতিবেশীদের হারাতে শুরু করলে ক্রিকেট সে দেশের বাজার হারাতে পারে। সেই সঙ্গে আমাদের বিনিয়োগকারী ও খাজনাভোগীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন! আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের দেশের খেলা অধিকসংখ্যক দর্শক আকর্ষণে ব্যর্থ হলে আবারো হোঁচট খাওয়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে।

সাধারণত যেসব দেশে অব্যবহৃত বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বেড়েছে, সেখানেই নানা ফাটকাজাতীয় ব্যবসা ভিড় জমিয়েছে। এবং দেশপ্রেমের ভাবাবেগে আবিষ্ট ক্রিকেট দর্শককে প্রলুব্ধ রেখে যেমন সেসব ব্যবসায়ী লাভবান হন, তেমনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে সাধারণ নাগরিকদের তুষ্ট রাখার এমন সুন্দর বিকল্প খুব কমই আছে। এ খেলায় ব্যাংক খাত যেমন লাভবান হয়, তেমনি ডে-নাইট খেলার সুবাদে ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ-ব্যক্তি খাতও মুনাফার সুযোগ পায়। বিশাল অঙ্কের খাজনা ভাগাভাগিতে শ্রম ও পণ্য রফতানি থেকে (এবং সম্ভবত গ্যাস ও তেল বিক্রি থেকে) দেশের আয় শেষাবধি স্থায়ী সম্পদে রূপান্তর হতে ব্যর্থ হতে পারে। শুধু তা-ই নয়, স্টেডিয়াম নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎ ব্যয়ভার ইত্যাদি ক্রিকেট খাতে বিনিয়োগ সর্বোত্তম কিনা এবং তা থেকে দীর্ঘমেয়াদি আয় নিশ্চিত কিনা, ভেবে দেখা প্রয়োজন

লেখক : ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের (ইআরজি) পরিচালক; ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির খণ্ডকালীন অধ্যাপক